দুই দিন

(গল্পগ্রন্থ – অসাধারণ)

রামনগর বারোয়ারি তলায় আজ খুব জাঁকের যাত্রা। কলকাতা থেকে দল এসেচে, বেশ বড় দল। রসিক বাঁড়ুজ্যের যাত্রার দল, যার নাম এ অঞ্চলের লোকের যথেষ্টই শোনা, কিন্তু এত বড় দল কি পাড়াগাঁয়ে আসে যখন তখন ?এবার বহু চেষ্টার ফলে ওদের আনা হয়েচে। রামনগর উচ্চপ্রাথমিক পাঠশালা থেকে ফেরবার পথেই কাতু এ সংবাদটি জোগাড় করে এনেচে। এ নিয়ে অনেক কথাবার্তাও হয়ে গিয়েচে কাতু ও তার বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে।

ননী ওদের বাড়ি এল পেয়ারা পাড়তে। কাতুর বাবা দুর্গাচরণ মজুমদার চোখে দড়ি বাঁধা চশমা পরে বাইরের ঘরে বসে জমিজমাসংক্রান্ত কাগজপত্র দেখছিলেন।

ননীকে দেখে বললেন—কি ?

দুর্গাচরণ বড় কড়াপ্রকৃতির মানুষ। ননী ভয়ে ভয়ে বললে—জ্যাঠামশায়, কেতো আছে ?

—কেন ?কি দরকার তোমার ?

—জ্যাঠামশায়, দুটো পেয়ারা পাড়ব ?

—তা পাড়বে না কেন ! তোমাদের জন্যেই তো গাছ করে রাখা, কেন পাড়বে না !

ননীর সাহসে কুলোল না আর পেয়ারার সম্বন্ধে কোনো কথা তুলতে। সে চলে যাচ্ছে বাড়ির বার হয়ে, এমন সময়ে কাতু তাকে দেখতে পেয়ে বাড়ির ভেতর থেকে ছুটে এল।

ননী বললে—ভাই, তোর বাবা পেয়ারা পাড়তে দিলে না—

কাতু আশ্বাস দিয়ে বললে—বাবা এখুনি উঠল বলে। নসবাপুর যাবে খাজনার তাগাদা করতে। সেই ফাঁকে তুই আর আমি পেয়ারা পাড়ব। আজ রাত্রে যাত্রা শুনতে যাবি নে ?

—তুই যাবি ?দল খুব ভালো, না ?

—ও বাবা, কলকাতার বড় দল, দেখিস কি চেহারা, কি সব সাজগোজ, কি গান,—

—তুই কি করে জানলি ?দেখিচিস নাকি ?

—সবাই বলচে রামনগরের বাজারে। দুশো টাকায় এক রাত—আর আমাদের বেলডাঙার দল আর বছর ত্রিশ টাকায় এক রাত গাইলে—রামোঃ, কিসের সঙ্গে কিসের কথা ! দুশো টাকা আর ত্রিশ টাকা !

কাতু আর ননী খুব হেসে উঠল এক চোট। তাদের মনে হল এমন একটা মজার কথা তারা কখনো বলেনি বা শোনবার সুযোগ পায়নি। উৎসাহের চোটে কাতু রসিক বাঁড়ুজ্যের দলের গুণাগুণ অনেক বাড়িয়ে বলে। তাদের দলের ভীম যে সাজে তাকে নাকি সে দেখে এসেচে, এক হাঁড়ি ভাত ডাল তার সামনে বেড়ে দেওয়া হয়েচে, তা সে একা খাচ্চে। তার চোখ দুটো লাল ভাঁটার মতো, দেখলে ভয় হয়। গলার সুর কি ! যেন বাঘের গলার আওয়াজ। ওদের তলোয়ারগুলো কিন্তু সত্যিকার তলোয়ার, অন্য অন্য বাজে দলের মতো রাঙতা বা টিনের নয়।

বলা বাহুল্য এ সবের কিছুই কাতু দেখে আসেনি। সে অবিশ্যি যাত্রাদলের বাসাতে গিয়েদেখেছিল অনেকগুলো লোক কলার পাতা পেতে ভাত খেতে বসেচে, তার মধ্যে কোন্‌টা ভীম কোন্‌টা নকুল কোন্‌টা বেদব্যাস সে তার কিছুই জেনে আসেনি।

ননী সব শুনে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললে—তোর বাবা তোকে নিয়ে যাবে। আমায় আমার মামা যেতে দেবে না। মামা যদি দেয়, মামিমা তো খাঁড়া উঠিয়ে আছে। আমার বড় ইচ্ছে যেতে।

দুই বন্ধুতে পরামর্শ করলে। ওরা যাবে নিশ্চয়ই। ননীকে যদি মামা না যেতে দেয় তবে সে লুকিয়ে যাবে কাতুর বাবার সঙ্গে। দুজনেরই বুক দুরদুর করচে কি হয় কি হয়।

সন্ধ্যার আগেই দুর্গাচরণ মজুমদার চাদর কাঁধে ফেলে লাঠি হাতে নিয়ে লণ্ঠন ঝুলিয়ে যাত্রা শুনতে বেরুলেন। কাতু গেল বাবার সঙ্গে, কিন্তু ননী বেচারির মামা প্রসন্ন না হওয়ায় তার বাড়ির বাইরে পা দেওয়া সম্ভব হল না।

কাতুর মন বেলুনের মতো ফুলে উঠেচে। এখুনি সে রসিক বাঁড়ুজ্যের যাত্রা দেখতে পাবে এখানে !

এ অসম্ভব ব্যাপার সম্ভব হবে এখুনি।

কতকগুলো লোক এসে আসরে আলো জ্বেলে দিয়ে গেল। লোকের ভিড় জমে গেল আসরে। বহু দূর-দূরান্তর থেকে লোক দেখতে এসেচে রসিক বাঁড়ুজ্যের যাত্রা, তাদের হাতে চিঁড়ের পুটুলি, বগলে তামাক টিকের ঠোঙা। আসরের বাইরে এক-একখানা থান ইট পেতে সবাই বসে গেল।

আসরে বাদ্যযন্ত্র আনা হল। সুর বাঁধা, টুন-টাং করতে আধঘণ্টা কাটল। কাতুর ধৈর্যের বাঁধ ভাঙে ভাঙে। রাজা কতক্ষণে আসবে ! ও বাবাকে জিজ্ঞেস করলে—কি পালা হবে বাবা ?

দুর্গাচরণ অন্য এক ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা বলছিলেন, ধমক দিয়ে বললেন—দেখো এখন কি হবে, আমি কি জানি ?দুর্গাচরণ যে লোকটির সঙ্গে কথা বলছিলেন তিনি বললেন—সত্যি আজ এদের কি প্লে হবে জানো ?নল-দময়ন্তী এদের নামকরা প্লে, দ্যাখো কি হয় !

এমন সময় পালার প্রোগ্রাম বিলি হল আসরে। কাতু তার বাবার-খানা চেয়ে নিলে। তারপর পড়ে দেখেই বিস্ময়ে আনন্দে বাবাকে দেখিয়ে বললে—বাবা, এই দেখো নল-দময়ন্তীর পালা হবে। নল-দময়ন্তী বাবা—দেখো না ?ও বাবা—নল-দময়ন্তী—

—আঃ, নল-দময়ন্তী তা কি করতে হবে ?নাচব ?চুপ করে বসে দ্যাখো !

যাত্রা আরম্ভ হয়ে গেল। বিস্ফারিত চোখে কাতু একদৃষ্টে চেয়ে দেখলে পঞ্চনল জাঁকজমকের সঙ্গে সলমা-চুমকির কাজ করা জরির পোশাক পরে সভাস্থল আলো করে বসেচে।

কি তাদের হাত-পা নাড়ার কায়দা, কি তাদের তরবারির আস্ফালন।

ইন্দ্রের সঙ্গে বরুণের কথা-কাটাকাটির কি বাহার !

আর গান ?এমন সুন্দর সুরের গান এ পর্যন্ত সে শোনেনি এ পাড়াগাঁয়ে।

দৃশ্যের পর দৃশ্য বদলে চলেচে। প্রত্যেক দৃশ্যে অভিনব ঘটনার সমাবেশ, নতুন নতুন সুরের গান, নতুন নতুন সুন্দর মুখ। পরীর মতো মেয়েরা। মেয়ে নয়, ওরা পুরুষ, কাতু জানে না যে এমন নয়, কিন্তু দু-একটি মেয়ে সম্বন্ধে, কাতু ঠিক বুঝতে পারলে না ওরা ছেলে না সত্যিই মেয়ে।

সে বাবাকে বললে—বাবা, ও বাবা—

দুর্গাচরণ বললেন—কি ?কেন কথা বলচো ?চুপ করে থাকো !

—ওরা মেয়ে না ছেলে ?

—চুপ করে বসে থাকো। বকো না।

কাতু তন্ময় হয়ে গিয়েচে, তার বাহ্যজ্ঞান নেই। একটা দৃশ্যে তার মন নেচে উঠল। এবার বোধ হয় যুদ্ধের আয়োজন চলবে ! কবিরাজ যে সেজেছে তার কি বিকট চেহারা আর সাজসজ্জা ! সত্যিই লোকটা খারাপ নাকি ?নিশ্চয় লোকটা খুব বদমায়েশ। বুড়োকঞ্চুকী কি হাসিয়েই গেল !

এইবার একটা করুণ দৃশ্যের অবতারণায় সভার লোক কেঁদে ভাসিয়ে দিল, সেই সঙ্গে কাতুও।

রাজ্যহারা নল বনে দিশাহারা অবস্থায় একটা বৃক্ষতলে আশ্রয় নিয়েছেন (বৃক্ষতলে আশ্রয় নেওয়ার ব্যাপারটা অবিশ্যি নলের বক্তৃতার মধ্যে দিয়েই প্রকাশ পেয়েচে, কেননা তিনি বসে আছেন আসরের ঝাড়লণ্ঠনের তলায়),

সঙ্গে রয়েচেন নিরাভরণা দময়ন্তী। প্রোগ্রামে আছে অলক্ষ্যে বিধিলিপির সঙ্গীত—নলের করুণ বক্তৃতা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে আসরের সকলে উঁকিঝুঁকি মেরে দেখচে বিধিলিপি সাজঘর থেকে বেরুল কিনা।

কাতু অধীর আগ্রহে দাঁড়িয়ে উঠেছে।

কিন্তু ঠিক যে সময় একটি বালককণ্ঠের মধুর সঙ্গীতের সুরে আসর ভরে গিয়েচে, দেখা গেল ধীরে ধীরে বিধিলিপি গান গাইতে গাইতে আসরে ঢুকচে, সেই সময় দুর্গাচরণ মজুমদার হাই তুলতে তুলতে বললেন—চলো অনেক রাত হয়েচে, যাওয়া যাক। বাড়ি চলো—ছাতি নাও হাতে—

কাতু অবাক ! বাবা কি সত্যিই বাড়ি যেতে চায় ?ঠিক এই সময় মানুষে পারে আসর ছেড়ে বাড়ি চলে যেতে ?কাতু বললে—বাবা, এখন বাড়ি যাবেন কি বলচেন ?আমি যাব না বাবা !

—না না, চলো। ও আর কি দেখবে সারারাত জেগে ! রাত দশটা। ওই নাকে-কান্না চলবে এখন সারারাত। চলো, চলো—ছাতিটা নে হাতে—ভিড়ে হারিয়ে যাবে। কাল আবার জেয়ালাতে খাজনার তাগিদে যেতে হবে ভোরে।

চলে আসতেই হল। উপায় নেই কাতুর। ওর চোখে জল ভরে এল। বাবার ওপর বিরাগে ওর মন তিক্ত হয়ে উঠেচে। কেমন লোক বাবা ?কিচ্ছু বোঝে না। এমন সুন্দর জায়গা—।

রাগে সে বাবার সঙ্গে কথা বললে না সারা রাস্তা।

পঁয়ত্রিশ-ছত্রিশ বছর পরের কথা।

কার্তিকচরণ মজুমদার সকালে উঠে কাগজপত্র দেখচেন। কার্তিকের মহাজনী কারবার আছে, আড়ত আছে ধানের ও পাটের। গত পঞ্চাশের মন্বন্তরে ধানচাল হাত-ফিরিতি করে বেশ কিছু লাভও করেচেন। তাঁর কর্মচারী হরিপদ এসে বললে—বড়বাবু, ছে-কাটি কখানা গাড়ি যাবে ?

—যে কখানা জোগাড় হয়। মাল কত ?

—দাদনের মাল হবে পঞ্চাশ মণ, আর ইদিক ওদিকে যা জোগাড় হয়।

—পাঁচখানা এখান থেকে নিয়ে যাও।

—লরির জন্যে শম্ভুকে খবর দিতে বলে দেলাম।

—লরি একখানা নয়, দুখানা। আমের গুঁড়ি যাবে সাতটা। চার টন।

—আপনি বেরুবেন কখন ?

—আমি খেয়েদেয়ে বেরুব। তুমি চলে যাও আগে—

এমন সময়ে কার্তিক মজুমদারের দশ বছরের পুত্র নীলু এসে বললে—বাবা, আজ থিয়েটার হবে রামনগরে। দেখতে যাব বাবা।

থিয়েটারের নিমন্ত্রণপত্র কার্তিক মজুমদার পেয়েছিলেন বটে, রামনগরের তরুণ-সংঘ আজ কি যেন একটা প্লে করবে তাতে লেখা ছিল। কিছু চাঁদাও তারা নিয়ে গিয়েছিল একদিন এসে। কিন্তু কর্মব্যস্ত কার্তিকের সে কথা স্মরণ ছিল না।

নীলু বললে—বাবা, যাবে তো ?

—দেখি আজ আবার অনেক গোলমাল। যেতে পারি কিনা দেখি।

—সে হবে না বাবা। তুমি না গেলে আমি যাব কার সঙ্গে ?আমার দেখা হবে না। থিয়েটার কক্ষনো আমি দেখিনি—

—আচ্ছা যাও, সকালে উঠে এখন পড়গে যাও—সে তো ওবেলা, তার এখন কি ?

এই সময়ে পাটের মহাজন ফলেয়ার মানিক মণ্ডল উঠোনে এসে দাঁড়িয়ে বললে—বড়বাবু, আমার তার কি হল ?

—কিসের ?

—আমার সেই মামলা আজ মিটিয়ে দেন বাবু।

—দেব। আজ পঞ্চাশ মণ আনচি দাদনের মাল, আরো একশো মজুত। তোমার কখানা লরি ?

—দুখানার বায়না দেওয়া আছে। মাল বেশি হলে আরো একখানা আনব। আমায় দুশো মণ জোগাড় করে দিতে হবে আপনার। একটু নেকনজর করুন—

কার্তিক তাকে আশ্বাস দিয়ে বাড়ির মধ্যে ঢুকলেন চা খেতে। কার্তিকের স্ত্রী বললেন—তা যাও না একবার খোকাকে থিয়েটার দেখিয়ে আনো না ?পাড়াগাঁয়ে ও-সব জিনিস তোকখনো হয় না—এবার হচ্ছে যখন ওকে দেখিয়ে আনো। ও কখনো দেখেনি।

কার্তিককে অগত্যা যেতে হল সন্ধ্যার সময় রামনগরের বাজারে, স্ত্রীর নিতান্ত পীড়াপীড়িতে। নতুবা ঝগড়া বাধে। কিন্তু মন তাঁর ভালো ছিল না। কর্মচারীরা সংবাদ দিয়েচে দাদনের পাট আশানুরূপ আদায় হয়নি। প্রায় সাড়ে সাত হাজার টাকা ছড়ানো রয়েচে চাষিমহলে ধান আর পাটের দাদন বাবদ। এত দুর্ভিক্ষের সময় চড়াদামে ধান চাল বিক্রি করে মোটা টাকা ঘরে এসেছিল বলেই এবার আশায় আশায় এত টাকা ছড়িয়েছিলেন, কিন্তু বাজার হঠাৎ নেবে যাবে বুঝতে পারা যায়নি। ধানের দামও অত্যন্ত কম, পাটও তথৈবচ। তারপর অতগুলো ছড়ানো টাকার বদলে ধান বা পাটআদায় হল না আজও।

নীলু দুধ-চিঁড়ের ফলার খেয়ে এসেচে। ছেলেমানুষের ক্ষিদে বেশি। কার্তিক কিছু খেয়ে আসেননি, তিনি অর্থ-উপার্জন-শক্তি অর্জন করবার সঙ্গে সঙ্গে পরিপাক-শক্তি হারিয়েছেন। রাত্রে খান দুখানা রুটি আর একটু দুধ। আগে খেতেন সুজির রুটি কিন্তু এখন যুদ্ধের বাজারে ঘনীভূতঅবস্থায় সুজি পাওয়া যায় না, আটার রুটিই খেয়ে থাকেন।

সন্ধ্যার পরেই থিয়েটার আরম্ভ হওয়ার কথা ছিল, কিন্তু চ্যাংড়া ছোকরাদের ব্যাপার, হৈ চৈ করতে দুঘণ্টা কাটার পরে রাত সাড়ে নটার সময় কনসার্ট বাজনা শুরু হল। একালের থিয়েটারে ওসব অচল বলে কোনো শহর-ঘেঁষা অতি-আধুনিক তরুণ সভ্য আপত্তি তুলেছিল। শেষ পর্যন্ত আপত্তি টেঁকেনি। কনসার্ট না বাজলে এ পল্লীগ্রামে থিয়েটার জমবে কেন ?

কার্তিক ছেলেকে নিয়ে একেবারে সামনের আসনে বসেচেন। তার কারণ এ নয় যে তিনি ভালোভাবে অভিনয় দেখতে পাবেন সেই উদ্দেশ্যে। এর প্রধান কারণ রামনগরের বাজারের প্রসিদ্ধ আড়তদার শরৎ নাথ ওখানে বসেছে। শরৎ নাথ এ অঞ্চলের বড় আড়তদার, তার পাশে বসে কার্তিক মজুমদার ব্যবসায়ের কথা বলতে আরম্ভ করলেন। তিনি আসলে জানতে চান শরৎ নাথের দাদন অনুযায়ী পাট ধান আদায় হচ্ছে কিনা। কেন এ বৎসর তাঁর এ বিপর্যয় ঘটল !

শরৎ নাথ ঘুঘু লোক, তিনি ব্যবসার প্রকৃত সংবাদ কাউকে প্রকাশ করতে রাজী নন। দুজনেই যখন কথাবার্তায় মশগুল তখন স্টেজে বন্দী অক্ষম সাজাহান জাহানারার হাত ধরে বিলাপ করচেন।

শরৎ নাথ বললেন—আর ভায়া, সে জুত বাজারের নেই। নতুন ধান সাড়ে তিন টাকা মণ। আলমপুর পরগণা ভোর পাটের দাদন ছড়িয়েচি, দুশো মণ পাট এখনো মজুত হয়নি। ব্যবসার দিন চলে গিয়েচে।

কার্তিক মজুমদার বললেন—আরে দাদা, তোমরা হলে হাতি। গেলেও দু-পাঁচ হাজার মরবে না। আর আমরা হচ্চি মশা, সামান্যতেই কষ্ট পাব। তারপর—

নীল বলচে—বাবা, ওই দ্যাখো আওরংজেব—বাবা, ভারতবর্ষের ইতিহাসে আছে আওরঙ্গজেবের কথা—সেই আওরংজেব—

—আঃ, তুমি খোকা বোকো না !

শরৎ নাথকে কার্তিক সব কথা খুলে বলেননি। ব্যবসার গুপ্ত কথা কেউ বলে না।

পাঁচশো মণ পাট তিনি চিনিলি কাপাসডাঙ্গার আড়তে জমা করে রেখেচেন, গরুরগাড়ি অভাবে আনতে পারচেন না সদর আড়তে, এখান থেকে লরিতে বোঝাই দেবেন।

গরুরগাড়ির কি ব্যবস্থা করে থাকেন শরৎ নাথ, এইটি কার্তিক মজুমদার জানবার উদ্দেশ্যে বার বার সেই কথাই ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে বলতে লাগলেন।

সাজাহান বলচেন—দেব লাফ, দিই লাফ—

নীলুর চোখ বেয়ে জল পড়চে। সে কথার অর্থ সে সব বুঝচে তা নয়, সাজাহানের কথা বলবার ভঙ্গিতে তার কান্না আসচে।

নীলু বললে—বুড়ো কি বলচে বাবা ?ও লাফ দেবে কোথায় ?

কার্তিক মজুমদার জবাব দিলেন—আঃ, চুপ করো। শোন কি বলচে। দুষ্টুমি করতে নেই।

দুষ্টুমি সে কি করলে, বুঝতে না পেরে নীলু চুপ করে রইল।

আরো ঘণ্টাখানেক কাটল। শরৎ নাথ পাঁচখানা গরুরগাড়ি কাল সকালে পাঠিয়ে দেবার অঙ্গীকার করেচেন।

বললেন—কত সকালে ?

—এই সাতটার সময়।

—তোমার বাড়ি পাঠাব, না আড়তে ?

—সদর আড়তে।

—লরি জোগাড় আছে ?

—সেজন্যে ভাবনা নেই। সুবল লরি দেবে বলেচে—ইস্টিশানে পৌঁছে দেবে মাল।

—ভাড়া মণকরা না টিপ পিছু ?

—টিপ পিছু।

জহরউন্নিসা রাজসভায় আওরংজেবকে হত্যা করতে গিয়েছিল এইমাত্র। খুব একচোট হাততালি পড়তেই কার্তিক মুখ তুলে চেয়ে দেখলেন। সুলতান সোলেমানের সঙ্গে আওরংজেবের কথা কাটাকাটি হচ্চে। কার্তিক মজুমদার ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। কত রাত হয়েচে ?এগারো ?

আর তিনি থাকতে পারচেন না। কাল সকালে উঠে সদর আড়তে শরৎ নাথের প্রেরিত পাঁচখানা গাড়ি বাদে আরো অন্তত পাঁচখানা গাড়ির জোগাড় রাখতে হবে।

নীলু বললে—না বাবা, আমি এখন উঠব না—কেমন জায়গাটা হচ্ছে আর তুমি উঠচো এখন—

—চলো চলো।ওসব দেখবার অনেক সময় আছে। কাল রাত থাকতেই আমাকে উঠে মুচিপাড়ায় লোক পাঠাতে হবে গাড়ির জন্যে। তোমাদের কি ?ভাবনা-চিন্তে তো নেই, বাবা—নাও ওঠো—

নীলু নিতান্ত অনিচ্ছার সঙ্গে কাঁদো কাঁদো মুখে বাবার সঙ্গে আসরের বাইরে এল।

বাইরে এসে দাঁড়িয়েও সে সতৃষ্ণ ও সাগ্রহ দৃষ্টিতে পিছন ফিরে বার বার দূরের আলোকিত স্টেজটার দিকে চেয়ে চেয়ে দেখতে লাগল।

কার্তিক মজুমদার বললেন—হোঁচট খেয়ে পড়ে যাবে—হাঁ করে দেখচো কি পেছন ফিরে ?চোখ দিয়ে চেয়ে পথ হাঁটো—অন্ধকার রাত্তির—